ইসলামী আন্দোলন সাফল্য ও বিভ্রান্তি

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামী আন্দোলন

সাফল্য ও বিভ্রান্তি

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.bjilibrary.com

পঞ্চম মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১২
চতুর্থ মুদ্রণ: মার্চ ২০০৯
কামিয়াব সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

ইসলামী আন্দোলন : সাফল্য ও বিভ্রান্তি ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০১৭৫০০৩৬৭৯০ ❖ স্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ❖ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : ষোল টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 62 6

www.bjilibrary.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এ পুস্তিকাটি ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সময়কার কতক সাংগঠনিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই বইটি রচিত।

ঐসব সমস্যার সমাধানের পর ঐ সংক্রান্ত আলোচনা বাদ দিয়ে, আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমন্বয়ে ১৯৮৮ সালে পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে পুনরায় প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলন স্বাভাবিক কারণেই ইবলিস ও তার মানুষরূপী খলীফাদের জন্য অসহ্য। তাই হাজারো উপায়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায়। মানুষকে আন্দোলনের পথে আসতে বাধা দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয় না। যারা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন তাদের মনে সূক্ষ্মভাবে নানা প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদেরকেও নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করে থাকে।

যারা ইখলাসের সাথে ইসলামী আন্দোলনে কর্মরত আছেন তাদেরকে শয়তান গুমরাহ করতে পারবে না বলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দান করেছেন। এ পুস্তিকাটি এ জাতীয় দীনী ভাই-বোনদের উপকারে আসবে বলেই আমি আশা করি। আল্লাহ তাআলা আমার এ আশা পূরণ করুন– এ দোআই করছি।

গোলাম আযম

জানুয়ারি ২০০৭

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য	০৫
ব্যক্তিগত সঠিক উদ্দেশ্য	০৬
ব্যক্তিগত ভুল উদ্দেশ্য	০৭
সমষ্টিগত উদ্দেশ্য	০৮
বিজয়ী হওয়ার শর্ত	০৯
তবুও সকল নবী-রাসূলই সফল হয়েছেন	১০
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য আদর্শ নমুনা	১১
বিজয়ই সমষ্টিগত আসল সাফল্য	১২
জামাআতবদ্ধ জিন্দেগী ফরয	১৩
বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন	১৫
জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠন	১৬
ইসলামী আন্দোলন বনাম শয়তানের প্ররোচনা	১৭
ইসলামী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা	১৯
বিচ্ছিন্ন হওয়ার তাৎপর্য	২০
সংগঠন ত্যাগের পদ্ধতি	২০
জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য	২১
বিকল্প আন্দোলন সৃষ্টি	২৩
ইসলামের বিজয় ও জামায়াতে ইসলামী	২৪
ক্যাডার সিস্টেম	২৫
হোল টাইম ওয়ার্কার	২৯

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামী আন্দোলন
সাফল্য ও বিভ্রান্তি

ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য

মানুষ যেকোনো কাজই করে সাফল্যের আশা নিয়ে। সে কাজে জান, মাল ও সময় খরচ করে। ব্যক্তিগত ছোটখাট কাজ হোক আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বড় কোনো পরিকল্পনাই হোক, যারা কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে তারা নিশ্চয়ই সাফল্য সম্পর্কে স্পষ্ট টার্গেট সামনে নিয়েই কাজ করে। বিনা উদ্দেশ্যে মানুষ কাজ করতে পারে না। যে উদ্দেশ্য ঠিক করা হয় তা হাসিল করতে পারলেই সাফল্য লাভ হলো বলে ধারণা করা হয়। সে হিসেবে কাজের পেছনে মানুষের যে উদ্দেশ্য থাকে তা হাসিল হওয়ার নামই সাফল্য।

ইসলামী আন্দোলনে যারা যোগদান করেন তারা নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই নিজের সময়, শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করেন। কোনো পার্থিব ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাহলে কী উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করা হয় তা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরি।

ইসলামী আন্দোলন কারো একার কাজ হতে পারে না। নবীগণের মতো মহান ও যোগ্য ব্যক্তিগণও জনগণকে আন্দোলনে শরীক করে সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা করেছেন। আন্দোলন করতে হলে বহু লোককে একজোট হতে হয়। তাই আন্দোলনের উদ্দেশ্য তালাশ করলে দু ধরনের উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে। যারা আন্দোলনে যোগদান করে তারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সামনে রাখে। আর গোটা আন্দোলন সমষ্টিগতভাবেও কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে টার্গেট বানায়।

www.bjilibrary.com

ব্যক্তিগত সঠিক উদ্দেশ্য

ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আখিরাতে নাজাত হাসিল করা। আখিরাতের সাফল্যই স্থায়ী– এটাই কুরআন মাজীদের মূল শিক্ষা।

আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার জন্য দুনিয়ায় যেভাবে জীবন যাপন করা উচিত সেভাবে চলাই ঈমানের দাবি। কুরআনে আমাদের দোআ শেখানো হয়েছে যে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান কর, আখিরাতের কল্যাণও দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।'

আখিরাতের কল্যাণ (হাসানা) মানে দোজখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ। এ কল্যাণ লাভ করতে হলে দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী চলতে হবে। আর এভাবে চলার তাওফীকই ঐ দোআয় চাওয়া হয়েছে। তাহলে দুনিয়ার কল্যাণ (হাসানা) হলো আল্লাহর পথে চলা। আখিরাতের পরওয়া না করে যেভাবে খুশি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগ করাকে কুরআনে দুনিয়ার আযাব বলা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা) আখিরাতের ঐ মহাকল্যাণ লাভের আশা নিয়েই রাসূল (স)-এর সাথে ইকামাতে দীনের আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন। শুধু নামায-রোযা ও যিকর-তিলাওয়াত দ্বারা যদি ঐ কল্যাণ হাসিল হতো, তাহলে রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধে যোগদান করা ফরয হতো না। আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় বাস্তবে চালু করাই রাসূল (স)-এর আসল দায়িত্ব ছিল। এ বিরাট দায়িত্ব পালনে যারা রাসূল (স)-এর সাথে জান-মাল দিয়ে শরীক হয়নি তারা রাসূলের ইমামতিতে মদীনার মসজিদে জামাআতে নিয়মিত নামায আদায় করেও মুনাফিক বলে ঘোষিত হয়েছে। এ থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইকামাতে দীনের প্রচেষ্টা ছাড়া ঈমানের দাবি পূরণ হয় না। অর্থাৎ, ইসলামী আন্দোলনে শরীক না হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব নয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আখিরাতে কামিয়াব হওয়ার কোনো আশা করা যায় না। তাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার ব্যক্তিগত আসল উদ্দেশ্য।

www.bjilibrary.com

ব্যক্তিগত ভুল উদ্দেশ্য

শয়তান মানুষকে ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য হাজারো রকমে চেষ্টা চালায়। যখন সে কোনো মানুষকে ফেরাতে ব্যর্থ হয় তখন কাজের সুফল থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য তার নিয়তকে সে কলুষিত করার চেষ্টা করে। বিশুদ্ধ নিয়তে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করার পর বিভিন্ন কারণে ও পরিবেশে শয়তান সুযোগ বুঝে এমন সব অনুচিত বিষয় তার নিয়তে শামিল করে দেয়, যা সে ব্যক্তির মহৎ উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করে ফেলে। শয়তান এত সূক্ষ্ম ও সুচতুরতার সাথে তাকে ভুল পথে নিয়ে যায়, সে টেরও পায় না যে সে ভুল করছে।

উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝতে সহজ হবে। সংগঠনের নির্বাচন বা আইন পরিষদ বা কোনো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে কোনো পদ পাওয়ার জন্য কারো মনে শয়তান আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। শয়তান তাকে এ কথাই বোঝায় যে, তোমার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থেই তোমার ঐ পদটি পাওয়া উচিত। তুমি এ দায়িত্ব না পেলে ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হবে। এভাবে যখন তার মন-মগজে ঐ পদের জন্য ইচ্ছা সৃষ্টি হয় তখনই তার নিয়ত আর বিশুদ্ধ থাকে না। সংগঠন যদি তাকে ঐ পদ পাওয়ার সুযোগ না দেয় তাহলে সে আন্দোলনে পিছিয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে সে নৈরাশ্য প্রকাশ করে।

যদি সে সংগঠনে কোনো পদ পায় তাহলে তার কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় যে, সে তার পজিশনকে মযবুত করার দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়। সংগঠনের দাবি পূরণের জন্য স্বাভাবিকভাবে যেসব দিকে বেশি মন দেওয়া দরকার সেসবকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্য সব কাজে সে আত্মনিয়োগ করে। যে পদে আছে তাতে দীর্ঘস্থায়ী থাকাই তার বিশেষ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানেও শয়তান তাকে এ কথাই বোঝায় যে, আন্দোলনের স্বার্থেই তোমাকে এ পদে মযবুতভাবে কায়েম থাকা দরকার।

এ অবস্থায় আন্দোলন যদি তাকে এ পদ ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেয় তবু সে ঐ পদে আঁকড়ে থাকতে চায়। সংগঠন তাকে পছন্দ করছে না বলে সে বুঝতে

www.bjilibrary.com

চায় না। পদে টিকে থাকার জন্য সংগঠনকে সংকটের দিকে ঠেলে দিতে সে পরওয়া করে না। ব্যক্তিগত জিদ তখন তার মন-মগজে এতটা প্রভাব বিস্তার করে বসে যে, সংগঠনের স্বার্থ তার নিকট কোনো গুরুত্বই পায় না। ইসলামী আন্দোলনের মহান স্বার্থ ভুলে সে আত্মসম্মানবোধের নিকট হার মানতে বাধ্য হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই যদি তার মূল উদ্দেশ্য হতো, তাহলে সংগঠন কোনো কারণে তাকে ভুল বুঝে তার প্রতি অবিচার করলেও সে কোনো অবস্থায়ই ইসলামী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারত না। ব্যক্তিচেতনা ও আত্মসম্মানবোধ কোনো অবস্থায়ই খাঁটি মুখলিস লোককে সংগঠনের বিদ্রোহী বানাতে পারে না। খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণের পর তিনি দীনের স্বার্থে যেভাবে তা মেনে নিয়েছেন, এক্ষেত্রে এটি একটি আদর্শ উদাহরণ।

যদি কারো নিয়তের পবিত্রতা বহাল থাকে, যদি শয়তানের প্ররোচনার অশুদ্ধ চিন্তা তাতে শামিল না হয়, তাহলে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের স্বার্থে সে তার সমস্ত জিদ ও ক্ষোভ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

সমষ্টিগত উদ্দেশ্য

ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলেও সমষ্টিগতভাবে আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর জমিনে দীন ইসলামকে বিজয়ী করা। মানুষের মনগড়া ব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবে কায়েম করাই এ আন্দোলনের টার্গেট। আল্লাহর রাসূল (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই ঐ টার্গেট লাভ করেছেন। রাসূল (স)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন এভাবেই সাফল্য অর্জন করেছে। সে হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত সফলতা ইসলামী হুকুমত কায়েমের উপরই নির্ভর করে। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালায়, তাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী হতে পারে না। এ বিজয় লাভ করাই ইসলামী আন্দোলনের সমষ্টিগত সাফল্য।

www.bjilibrary.com

এখানে একটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তাআলা সকল রাসূলকেই ইকামাতে দীনের দায়িত্ব দিয়েছেন; কিন্তু তাঁদের সবাই মুহাম্মদ (স)-এর মতো সাফল্য অর্জন করেননি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের জীবনে ইসলামকে বিজয়ী করে যেতে পারেননি, তারা কি রাসূল বা নবী হিসেবে ব্যর্থ হয়েছেন? ইসলামকে বিজয়ী করতে না পারার দরুন আল্লাহ্ তাআলা কি তাঁদেরকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন? তাঁদেরকে কি এজন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে? নবীগণের মধ্যে যাঁরা দীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেননি, তাদেরকে কি এ বিফলতার জন্য দায়ী করা হয়েছে? কুরআন মাজীদে যে কয়জন নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই বিজয়ী হয়েছেন। তাহলে বাকি সবাই কি ব্যর্থ হয়েছেন?

বিজয়ী হওয়ার শর্ত

ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য প্রধানত দুটো শর্ত রয়েছে। প্রথমত, এমন একদল মুখলিস লোক জোগাড় হওয়া দরকার, যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য জান-মাল দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা চালাতে থাকবে। দ্বিতীয়ত, যে দেশে ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা চলছে, সে দেশের জনগণের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকা। জনগণ যদি সক্রিয়ভাবে বিরোধী হয় তাহলে বিজয় সম্ভবই নয়। জনগণ সক্রিয়ভাবে বিরোধী না হলেই পরোক্ষ সমর্থন আছে বলে মনে করা যায়।

রাসূল (স)-এর সময় মাক্কী যুগে প্রথম শর্তটি পূরণ হলেও দ্বিতীয় শর্তটি মক্কায় পাওয়া যায়নি বলেই সেখানে দীন বিজয়ী হতে পারেনি। মদীনায় দ্বিতীয় শর্তটি পাওয়া গেছে বলে, সেখানে হিজরত করার পর ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হলো। এ দুটো শর্তের মধ্যে অধিকাংশ নবীর জীবনেই দেখা যায় যে, দ্বিতীয় শর্তটি একেবারেই অনুপস্থিত। এর জন্য আল্লাহ্ তাআলা কখনো নবীগণকে দায়ী করেননি। প্রথম শর্তটির বেলায়ও দেখা যায় যে, ইবরাহীম (আ) ও ঈসা (আ)-এর মতো বিশিষ্ট রাসূলগণও একদল ত্যাগী সমর্থক পাননি। লূত (আ) তো কোনো সহকারীই পাননি। নূহ (আ) সাড়ে নয় শ বছর চেষ্টা করেও স্বল্পসংখ্যক লোকের সমর্থন পেয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী আন্দোলনের সমষ্টিগত বিজয় শুধু নবীগণের যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে না। আল্লাহর নবীগণের সবাই যোগ্য লোক ছিলেন। কোনো অযোগ্য লোককে তিনি নবী নিযুক্ত করেননি। তাই যাদের হাতে ইসলাম বিজয়ী হয়নি তাদেরকে অযোগ্য বলে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। যে দুটো শর্ত বিজয়ের জন্য জরুরি তা নবী-রাসূলগণের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পূরণ হয়নি। এ শর্ত দুটো পূরণ করা নবী-রাসূলগণের ইখতিয়ারভুক্ত নয়। মানুষকে জোর করে সমর্থক বানানোর কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্বও নবী-রাসূলগণকে দেওয়া হয়নি।

তবুও সকল নবী-রাসূলই সফল হয়েছেন

দুনিয়ার জীবনের সব কাজের জন্য প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর কাছে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। আখিরাতে নবীগণও আল্লাহর কাছে দুনিয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে হিসাব দেবেন। দায়িত্ব পালনে তাঁরা যেহেতু কোনো অবহেলা করেননি, সেহেতু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা সবাই সফল হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। অর্থাৎ, যাঁদের আন্দোলন বিজয় লাভ করতে পারেনি তাঁরা আখিরাতে সফল বলে গণ্য হলেও দুনিয়ায় তাঁরা কি ব্যর্থ হয়েছেন? আল্লাহ তাআলা এক জনের দোষকে আরেক জনের উপর চাপিয়ে দেন না। নবীর দায়িত্ব ছিল দীনের দাওয়াত ঠিকমতো পৌঁছে দেওয়া। যদি মানুষ সে দাওয়াত কবুল করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে সে ব্যর্থতার জন্য নবীগণ কেন দায়ী হবেন? তাই দুনিয়ায়ও তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছেন। কাওমের ব্যর্থতার কারণে নবীগণকে ব্যর্থ বলা চলে না।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত নবীগণের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, দুনিয়ায় তাদের সাফল্য ছিল চার রকমের :

১. কতক নবী হিজরত ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সুযোগ পেয়েছেন। যেমন– হযরত ইউসুফ (আ) ও হযরত দাউদ (আ)।

২. কতক নবী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন বটে; কিন্তু যেখানে তারা আন্দোলন শুরু করেছেন, সেখান থেকে তাদেরকে বাধ্য হয়ে হিজরত করতে হয়েছে। যেমন– হযরত মূসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (স)।

www.bjilibrary.com

৩. বহু নবীর জীবনে দেখা যায় যে, দীর্ঘকাল মানুষকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার পরও যখন জনগণ কিছুতেই আল্লাহর আনুগত্য করতে রাজি হলো না তখন আল্লাহ তাদের কাওমের উপর গযব নাযিল করলেন; কিন্তু গযব আসার আগে তিনি নবী ও তাঁর সাথীদেরকে গযব থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছেন। যেমন– হযরত নূহ (আ), হযরত লূত (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত শোআইব (আ), হযরত সালেহ (আ)।

৪. কুরআনে বিশেষ করে বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়েছে যে, এরা নবীগণকে পর্যন্ত কতল করেছে। অর্থাৎ, ঐসব নবীকে শহীদ হতে হয়েছে। শহীদ হয়েও তাঁরা দায়িত্ব পালনের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। যেমন– হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আ)। যেসব যালিম কাওম নবীগণকে শহীদ করেছে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ অবশ্যই করেছেন। কিন্তু ঐ নবীগণকে তিনি শাহাদাতের আদর্শ কায়েম করার সুযোগ দিলেন, যাতে ইসলামী আন্দোলনের পথে যারা চলতে চায় তারা শাহাদাতকেও সাফল্যই মনে করে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য আদর্শ নমুনা

নবীগণই ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ নেতা। তাঁদের জীবন থেকেই সকল যুগের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে তাঁরা যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন সে নমুনা থেকেই আমাদের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যেমন তারাই আমাদের আদর্শ, তেমনি তাঁদের জীবনে যা ঘটেছে সে বিষয়েও তাঁরাই আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

ইসলামী আন্দোলনের যে চার প্রকার সাফল্য নবীগণের জীবনে দেখা গেছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যে ধরনের সাফল্যই তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করেছেন, তাতে তাঁরা কখনো আপত্তি করেননি। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চাননি। আমরা যদি নবীগণকেই আদর্শ মনে করি তাহলে আমাদেরও ঐ মানসিকতাই থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা যে ধরনের

www.bjilibrary.com

সাফল্যই দান করেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। সাফল্যের ধরন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। আমাদের আসল কাজ হলো– নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে তুলে দেওয়া, তার ইচ্ছার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, ইকামাতে দীনের দায়িত্ববোধ নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে রাসূল (স)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের পথ ধরে চলতে থাকা। এর ফল কী ধরনের পাওয়া যাবে, তা আল্লাহর মর্জির উপর ছেড়ে দিয়ে ইখলাসের সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকাই আসল সাফল্য। এ মহান কাজ থেকে কোনো কারণে দূরে সরে পড়াই প্রকৃত ব্যর্থতা। কোনো অজুহাত তুলে, কোনো ওজরকে বাহানা বানিয়ে, সংগঠনের কোনো সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করে বা কোনো দায়িত্বশীলের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ইসলামী আন্দোলনের কাজে ঢিলা দিলে বা তা থেকে পিছিয়ে পড়লে ব্যক্তিগত ব্যর্থতাই প্রমাণিত হবে। আর কোনো দায়িত্বশীল এ জাতীয় আচরণ করলে সমষ্টিগত ব্যর্থতার জন্যও তিনি দায়ী হতে পারেন।

বিজয়ই সমষ্টিগত আসল সাফল্য

এ কথা ঠিক যে, যে রূপেই সাফল্য আসুক তাতে রাজি থাকার মনোভাব পোষণ করার ভুল অর্থ থেকে সাবধান থাকতে হবে। বিনা পরিকল্পনায় গতানুগতিক নিয়মে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং বিজয়ের টার্গেট ছাড়া শুধু সওয়াবের আশায় কাজ করতে থাকা আর যাই হোক ইসলামী আন্দোলন নয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার সুপরিকল্পিত কার্যসূচি না থাকলে আল্লাহ তাআলা জবরদস্তি করে বিজয় চাপিয়ে দেবেন না। আল্লাহর দীনকে মানবরচিত সব বিধানের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব থাকার ফলেই রাসূল (স) প্রয়োজনবোধে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মদীনাকে কেন্দ্র করে বিজয়ের চেষ্টা করেন। এ রকম নির্দিষ্ট টার্গেট ছাড়া কাজ করলে ইসলামের কিছুটা খিদমত হতে পারে; কিন্তু ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না।

ইসলামের বিজয় হচ্ছে না দেখে নিরাশ হওয়া যেমন ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ, তেমনি নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে কি না সে দিকে লক্ষ না রেখে জনগণকে দোষ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বিজয়ের টার্গেট ঠিক করে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিকল্পনাভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। সুফল না পেলে

www.bjilibrary.com

নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কোনো কর্মপদ্ধতি ভুল প্রমাণিত হলে অভিজ্ঞতার আলোকে তা বদলাতে হবে। মোট কথা, বিজয়ের দিকে আমরা এগুচ্ছি কি না, সে দিকে লক্ষ রেখেই আন্দোলনে গতি সঞ্চার করতে হবে। কারণ, বিজয়ই আন্দোলনের সমষ্টিগত আসল সাফল্য। অবশ্য যদি সাফল্যের এ লক্ষ্য হাসিল নাও হয়, তাতে ব্যক্তিগত সাফল্যের কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টিই ব্যক্তিগত সাফল্য এবং এ সাফল্য বিজয়ের উপর নির্ভরশীল নয়।

জামাআতবদ্ধ জিন্দেগী ফরয

আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ফরয। এমনকি আল্লাহর আনুগত্যও একমাত্র রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। আর ইকামাতে দীনই রাসূল (স)-এর প্রধান দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই জামাআতী জিন্দেগীকে ফরয করা হয়েছে। আল্লাহর দীন কবুল করলে রাসূলের জামাআতে শামিল হওয়াও ফরয। রাসূল (স) নিজে যত দিন দুনিয়ায় এ জামাআতের নেতৃত্ব দিয়েছেন তত দিন তাঁর জামাআতে শামিল না হলে কেউ মুসলিম হিসেবেই গণ্য হতো না। অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর জামাআতের বাইরে ইসলাম নেই। একমাত্র তারাই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য, যারা রাসূল (স)-এর জামাআতে শামিল। রাসূল (স)-এর জামাআতই হলো 'আল জামাআত' বা একমাত্র জামাআত।

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিমদের নেতৃত্ব বিভিন্ন লোকের উপর ন্যস্ত হতে পারে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের আলাদা আলাদা জামাআত হওয়াও স্বাভাবিক। এমনকি একই দেশের মুসলমানদের একাধিক জামাআতে ছড়িয়ে থাকাও অস্বাভাবিক নয়। তাই এসব জামাআতের কোনো একটি 'আল জামাআত' বলে গণ্য হতে পারে না। অর্থাৎ, কোনো এক জামাআতের এমন দাবি করার অধিকার নেই যে, ঐ জামাআতের বাইরে থাকলে কেউ মুসলিম বলে গণ্যই হবে না।

আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (স)-এর আনুগত্যের ভিত্তিতে মুসলমানগণ যদি জীবন যাপন করে এবং দীনের খিদমত বা ইকামাতের জন্য যদি তারা জামাআতবদ্ধ হয় তাহলে এ জাতীয় সব জামাআতই 'আল জামাআত'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য

www.bjilibrary.com

হবে। এ সম্পর্কে যে পরিভাষা উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে চালু হয়েছে তা হলো, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'।

আসল কথা হলো, মুসলমানদেরকে জামাআতবদ্ধ হয়ে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই জামাআতবদ্ধ হওয়া দীনের বড় দাবি। জামাআতবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো, দীনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়া। এর জন্য শর্ত হলো দুটো– ইমারাত ও ইতাআত অর্থাৎ নেতৃত্ব ও আনুগত্য। যেমন– মসজিদে যখন ইমামের আনুগত্য করে একসাথে নামায আদায় করা হয় তখনই তা জামাআতে নামায বলে গণ্য হয়। হাজার হাজার নামাযী একই বড় মসজিদে আলাদা আলাদা নামায আদায় করলে জামাআতে নামায হয় না। ইমামের নেতৃত্ব ও মুক্তাদিদের আনুগত্যই জামাআত বলে গণ্য হওয়ার শর্ত।

জামাআতবদ্ধ জীবন ছাড়া যে মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকা যায় না, সে কথা তাকীদ দিয়ে বোঝানোর জন্য একখানা হাদীসই যথেষ্ট :

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوٰى جَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثٰى جَهَنَّمَ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى. قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ. (رَوَهُ اَحْمَدُ وَ حَاكِمْ)

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এসবের হুকুম দিয়েছেন : ১. আল জামাআত, ২. (নেতার আদেশ মন দিয়ে) শোনা, ৩. (নেতা ও সংগঠনের) আনুগত্য করা, ৪. হিজরত ও ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

কাজেই যে ইসলামী জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণও বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলল। আবার ফিরে এলে অবশ্যই আলাদা কথা। আর যে জাহিলিয়াতের দিকে ডাকবে সে দোযখী হবে। সাহাবীগণ

www.bjilibrary.com

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে যদি নামায-রোযা করে তবুও?' রাসূল (স) জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, যদিও সে নামায-রোযা করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে।'

এ হাদীসে রাসূল (স) জামাআতবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব, নেতার আনুগত্য ও আন্দোলনের প্রয়োজনে হিজরত ও জিহাদের তাকীদ যে ভাষায় দিয়েছেন, তাতে জামাআতবদ্ধ জিন্দেগীর ফরয হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন

কেউ জামায়াতে ইসলামীকে পছন্দ করুক আর না-ই করুক, এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, জনগণ এ দেশে ইসলামকে একটি আন্দোলন হিসেবে এ জামাআতের মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। ইসলাম যে কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ধার্মিকতার প্রচলিত সীমাবদ্ধ ধারণা যে ইসলামের দাবি মোটেই পূরণ করে না, কুরআন ও হাদীসে ইসলামকে যে মানবজাতির জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে দেওয়া হয়েছে, রাসূল (স)-কে যে দীন ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে, ইকামাতে দীনের ঐ দায়িত্ব পালন করা যে মুসলমানদের উপর আল্লাহর দেওয়া সব ফরযের বড় ফরয এবং আল্লাহর দীন যে বাতিলের অধীনে কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য আসেনি, এসব কথা জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই এ দেশে চালু হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার কারো ক্ষমতা নেই।

একটি বিজ্ঞানসম্মত ইসলামী আন্দোলনের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সংগঠন ও ট্রেনিংয়ের যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি প্রয়োজন তা জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য কোনো ইসলামী সংগঠনের মধ্যে চালু আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ দেশে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সব ধরনের লোককে পর্যায়ক্রমে আন্দোলনমুখী করে গড়ে তোলার জন্য যে বহুমুখী কার্যক্রম জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে, তা অনুভব করে এ দেশের বাতিলপন্থিরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এ আন্দোলনকে গতিহীন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

ছাত্র-অঙ্গন, ছাত্রীমহল, শ্রমিক ময়দান, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহলে ইসলামী আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছে তা আল্লাহর রহমতে জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টারই সুফল। ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর অবদান কে অস্বীকার করতে পারে? এ দেশের যে কয়জন ওয়ায়েজ জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর বিপ্লবী চিন্তাধারারই বাহক। তাঁরা ইসলামকে এবং কুরআন মাজীদকে যেভাবে পেশ করছেন তা জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এর ফলে উল্লেখযোগ্য ওয়ায়েজগণের মধ্যে এ চিন্তাধারার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে, বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে যারাই কথা বলেন, তারা জামায়াতে ইসলামীর প্রচারিত সাহিত্যের ভাষায়ই বলেন। এমনকি যারা জামায়াতের বিরোধিতা করেন, তারাও 'ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা', 'রাসূল (স) জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবজাতির জন্য আদর্শ', 'কুরআন শুধু ধর্মীয় কিতাব নয়; মানবজীবনের স্থায়ী বিধান' ইত্যাদি কথা তাদের বক্তৃতায় বলে থাকেন। দেশের প্রেসিডেন্ট, সামরিক ও বেসামরিক বড় বড় দায়িত্বশীল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও বিভিন্ন সময়ে যে এ জাতীয় কথা স্পষ্টভাবেই বলেন, তা দেশের পত্র-পত্রিকায় সবাই দেখতে পান। এসব যে জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারারই প্রভাব, তা কারো অজানা নয়।

একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, তা পূরণ হলে আল্লাহ তাআলা সরকারি ক্ষমতা দান করেন বলে কুরআনে ঘোষণা করা আছে। তাই ক্ষমতা দখলের জন্য জামায়াতে ইসলামী কোনো কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করে না। জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের ফলে দেশে যতটুকু দীনী চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, তা অবশ্যই আশাপ্রদ। আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী একটি সুসংগঠিত ইসলামী আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত।

জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠন

ইসলামের খিদমতের জন্য দেশে যত প্রকার ছোট-বড় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সবার খিদমতকে জামায়াতে ইসলামী শ্রদ্ধা ও মহব্বতের দৃষ্টিতেই

www.bjilibrary.com

দেখে। এমনকি যেসব রাজনৈতিক দল নিজেদেরকে ইসলামী মনে করে, তাদেরকেও জামায়াত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না; বরং তাদেরকে দ্বীনী সহযোগী হিসেবেই দেখতে চায়। রাজনীতিসহ কোনো ময়দানেই জামায়াতে ইসলামী 'দোকানদারী মনোভাব' পোষণ করে না। জামায়াতে ইসলামী যেসব কাজ করে এবং যে ময়দানে কর্মরত আছে, সেসব ক্ষেত্রে অন্য কোনো সংগঠন কায়েম হলে জামায়াতের সমর্থক সংখ্যা কমে যাবে বলে জামায়াতে ইসলামী কখনো ভয় পায় না; বরং উন্নত মানের ইসলামী আন্দোলন হিসেবে অন্য কোনো সংগঠন ময়দানে থাকলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী নিজের মান বৃদ্ধি করার অনুপ্রেরণাই পেতে পারত।

এ দেশের সবাই সাক্ষী যে, আজ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী অন্য কোনো ইসলামী সংগঠনের সামান্যতম সমালোচনাও করেনি। কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো সময় জামায়াতের পক্ষ থেকে কিছু করা হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না। জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন এবং নিজেকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব পরিচয় দিয়ে যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন, তাদের প্রতিবাদেও জামায়াত কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেনি। জামায়াতে ইসলামী অন্তর দিয়ে কামনা করে যে, দেশের সকল ইসলামী ব্যক্তি ও সংগঠন এবং ওলামা-মাশায়েখ ইসলামবিরোধী শক্তির মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হোন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ বহাল রেখে ও কতক কর্মসূচিতে একজোট হয়ে কাজ করতে পারলে এ দেশে ইসলামী বিপ্লবের পথ কেউ রোধ করতে পারবে না।

ইসলামী আন্দোলন বনাম শয়তানের প্ররোচনা

আল্লাহর দীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকেই ইসলামী আন্দোলন বলে। আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে উৎখাত করে, যা তিনি পছন্দ করেন তা চালু করার চেষ্টাকেই ইকামাতে দীন বা দীন কায়েমের আন্দোলন বলা হয়। এ কাজই

www.bjilibrary.com

নবী-রাসূলগণ করে গেছেন। এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন বলে কুরআনের তিন জায়গায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। (সূরা তাওবা : ৩৩, সূরা ফাত্হ : ২৮, সূরা সফ্ : ৯)

এ কাজটিই দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন ও জটিল কাজ। যে সমাজেই কেউ এ কাজ শুরু করে তার সাথে ঐ প্রতিষ্ঠিত সমাজের সকল সুবিধাভোগী ও কায়েমী স্বার্থের বিরোধ না হয়ে পারে না। কায়েমী স্বার্থ তাদেরকেই বলে, যাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ঐ সমাজে আছে। সমাজের আইন, অর্থব্যবস্থা, রাজনৈতিক পদ্ধতি, এমনকি ধর্মীয় রীতিনীতি এমনভাবে রচিত ও চালু হয়ে যায়, যাতে একশ্রেণীর লোকের স্বার্থ নিরাপদ থাকে। এরাই হলো কায়েমী স্বার্থ। যে সমাজে আল্লাহর রচিত বিধান চালু নেই, সেখানে মানবরচিত বহু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। ফলে এ জাতীয় কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। একমাত্র আল্লাহই নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ বিধান দিতে সক্ষম। মানুষের হাতে বিধান রচনার দায়িত্ব দিলে কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

এ কারণেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এমনকি ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের সাথে প্রত্যেক নবী-রাসূলেরই বিরোধ হয়েছে। সমাজে যে বিধান চালু আছে তা বদলে আল্লাহর বিধান চালু করার চেষ্টা করলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারা কী করে তা সহ্য করতে পারে? আল্লাহর বিধান যারা কায়েম করতে চায়, ইবলিসের বাহিনীও তাদেরকে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। আল্লাহর রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলে ইবলিসের রাজত্ব কী করে টিকতে পারে?

সুতরাং যখনই কোনো লোক ইসলামী আন্দোলনে শরীক হতে চায় তখন একদিকে কায়েমী স্বার্থ তাকে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়। অপরদিকে শয়তান হাজার ধরনের কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সে ইসলামী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন শয়তান সুযোগ খুঁজতে থাকে, যাতে কোনো দুর্বল মুহূর্তে তাকে পথভ্রষ্ট করা যায়। তাই এ পথে যারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে চায় তাদেরকে সব সময় এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন থাকতে হয়।

www.bjilibrary.com

বিচ্ছিন্ন হওয়ার তাৎপর্য

যারা ইসলামী আন্দোলনকে একবার বুঝতে পেরেছে তারা এ কথা নিশ্চয় বিশ্বাস করে যে, ইকামাতে দীনের আন্দোলন এমন ব্যাপার নয় যে, কোনো অজুহাতেই ছেড়ে দেওয়া যায়। ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠনে যোগ দেওয়ার পর একটি মাত্র কারণেই এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েয। যে দীনী উদ্দেশ্যে এ সংগঠনে যোগদান করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যদি এর চেয়ে উন্নত কোনো সংগঠন পাওয়া যায়, তাহলে নিম্ন মানের সংগঠন ত্যাগ করে উন্নত মানের সংগঠনে যাওয়া দূষণীয় নয়। অবশ্য নিজেকে উন্নত মানের সংগঠন কায়েম করার যোগ্য মনে করেও কেউ সংগঠন ত্যাগ করতে পারে।

ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করা খেলার কথা নয়। ইসলামী সংগঠনে শরীক হওয়া ফরয। রাসূল (স) এর উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, জামাআত বা ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করা ইসলামের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার সমান। অবশ্য কী নিয়তে সংগঠন ত্যাগ করছে তার উপরই এর পরিণাম নির্ভর করবে। আল্লাহর কাছে নিয়ত গোপন থাকে না। যদি সত্যিই উন্নততর সংগঠন পাওয়া গিয়ে থাকে বা উন্নত মানের সংগঠন কায়েমের যোগ্যতা থেকে থাকে তাহলে ভালো কথা। কিন্তু যদি অন্য কোনো কারণে সংগঠন ত্যাগ করে থাকে তাহলে হাজার বার চিন্তা করা উচিত যে, ঈমানের হেফাযত হচ্ছে কি না।

সংগঠন ত্যাগের পদ্ধতি

প্রত্যেক সংগঠনেরই গঠনতন্ত্র বা সংবিধান থাকে। সংবিধানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কোনো না কোনো পরিষদে দেওয়া থাকে। যদি ঐ 'পরিষদের' সিদ্ধান্ত পছন্দ নাও হয় তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে সংগঠন ত্যাগ করার শরয়ী অধিকার থাকে না। যদি কোনো সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টরূপে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হয় তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু কোনো বিষয়ে কারো মতের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়নি বলে যদি কেউ সংগঠন ত্যাগ করে, তাহলে তা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করার জন্য এটা কোনো যুক্তিই হতে পারে না। এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বশীল কোনো পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত যদি কোনো ব্যক্তি সংবিধানবিরোধী বলেও মনে করে, তবুও তার নিজস্ব ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ঐ সিদ্ধান্ত অমান্য করার কোনো অধিকারই স্বীকৃত নয়।

www.bjilibrary.com

এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে দোআ শিক্ষা দিয়েছেন :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা হতে দিও না এবং আমাদের উপর তোমার খাস রহমত বর্ষণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সত্যিকার দাতা। (সূরা আলে ইমরান : ৮)

ইসলামী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী একটি বিজ্ঞানসম্মত ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বলিষ্ঠ যুক্তিসহকারে বিপুল ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে পেশ করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সমন্বয়ে একদল নিঃস্বার্থ নেতা তৈরি করেছে। অবশ্য কর্মী ও নেতাদের মান আরো অনেক উন্নত হতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে।

এ আন্দোলনের ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিক-চাষীসহ সকল মহলে বিভিন্ন সংগঠন আপন আপন ক্ষেত্রে ইসলামী মন-মগজ ও চরিত্র সৃষ্টির অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কুরআনের তাফসীর, ইসলামী সেমিনার, সীরাত মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে গোটা দেশে ইসলামের ভাবধারা জনগণকে ইকামাতে দীনের দিকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

যারা এ আন্দোলনে শরীক হয়ে এর কোনো একটি সংগঠনে কর্মী হিসেবে কিছু দিন কাজ করেছে তাদের পক্ষে এ কথা উপলব্ধি করা খুবই স্বাভাবিক যে, এর চেয়ে উন্নত কোনো সংগঠন এ দেশে নেই। তাই আজ পর্যন্ত দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এসব সংগঠন থেকে বের হয়ে গিয়ে অন্য কোনো সংগঠনে কেউ যোগদান করেননি। কোনো কোনো সময় অবশ্য কতক লোক বের হয়ে গিয়ে এর চেয়ে উন্নত সংগঠন কায়েমের স্বপ্ন দেখেছেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করতে পারেননি।

www.bjilibrary.com

ইসলামে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। তাই ইমাম যদি ফাসেকও হয় তবুও তার পেছনে নামায আদায় করতে হয়। জামাআত ত্যাগ করে একা নামায আদায় করার অনুমতি শরীআত দেয়নি। ফাসেক ইমামকে বদলানোর নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার অনুমতি অবশ্যই আছে; কিন্তু জামাআত ত্যাগের অনুমতি নেই।

সুতরাং সংগঠনের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হওয়ার অজুহাতে বা কোনো ইস্যুতে নিজের মতামত সংগঠনকে গ্রহণ করাতে অক্ষম হয়ে বা অন্য কোনো প্রকার অসন্তোষের কারণে সংগঠন ত্যাগ করা শরীআতের দৃষ্টিতে একেবারেই অন্যায়। সংগঠনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করা রীতিমতো বাগাওত বা বিদ্রোহ এবং 'ফাসাদ ফিল আরদ' বা জমিনে শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার অপরাধ। ইকামাতে দীনের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছাড়া যারা কোনো রকম জিদের বশবর্তী হয়ে বা ক্ষোভের কারণে আবেগতাড়িত হয়ে বিদ্রোহ করে, তারা ধীর মস্তিষ্কে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করলে তাদের ভুল বোঝার তাওফীক হতে পারে। দীনের ব্যাপারে ইখলাস থাকলে ভুল ধরা পড়বেই। আর বিবেকের নিকট ভুল ধরা পড়লে ঈমানের তাকীদে ভুল পথ ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। আর সৎ সাহস থাকলে সংগঠনে ফিরে আসাও অসম্ভব নয়।

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

একটি সংগঠনকে সবদিক দিয়ে সুস্থ ও নির্দোষ রাখার জন্য জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) শুরু থেকে এমন চমৎকার ও নিখুঁত সাংগঠনিক বিধি-বিধান চালু করেছেন, যার ফলে এ জামাআতে কোনো রকম সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। 'ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলি' ও 'জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী' বইয়ের প্রথম থেকে চতুর্থ খণ্ডের মধ্যে ঐসব সাংগঠনিক বিধান কর্মীদের মধ্যে চর্চা করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং কর্মীদের ট্রেনিংয়ের মধ্যেও বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঐসব বিধানের মধ্যে দুটো সাংগঠনিক বিধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একটি হলো 'তানকীদ ও মুহাসাবা' অর্থাৎ পারস্পরিক সমালোচনা ও সংশোধনের সুযোগ। এ সংগঠনে ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তি দূর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীতে আনুগত্যের উপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া

www.bjilibrary.com

হয়, সমালোচনা ও সংশোধনেরও তেমনি সুযোগ আছে। নেতাদেরকে খোলাখুলি প্রশ্ন করার এমন সুযোগ এবং কর্মীদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাদের সন্দেহ মোচনের ও তাদের অসন্তোষ দূর করার এমন ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকার আর কোনো সংগঠনের আছে বলে আমাদের জানা নেই। নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ও নেতাদের সমালোচনার এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা জামায়াতে ইসলামীরই বৈশিষ্ট্য এবং এটা মাওলানা মওদূদী (র)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

এই বৈশিষ্ট্যের ফলে জামায়াতের সংগঠন কখনো বিভক্ত হয়নি। এ পর্যন্ত সংগঠনের মধ্যে এ কারণেই কোনো উপদলও সৃষ্টি হতে পারেনি। সমালোচনা ও সংশোধনের মাধ্যমে সব রকম বিরোধের এমন সমাধান করা হয়, যার ফলে সাংগঠনিক ঐক্য বিনষ্ট হয় না। উপমহাদেশে প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন নেতার নামে উপদল সৃষ্টি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন নেতার নাম বন্ধনীযুক্ত হয়ে একই নামে একাধিক দল সৃষ্টি হয়েছে। উপমহাদেশের সব দেশেই জামায়াতে ইসলামী বহু বছর থেকে কাজ করছে। আল্লাহর রহমতে এ জাতীয় কোনো ঘটনা এখনো ঘটেনি। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যই এর আসল কারণ।

দ্বিতীয় যে সাংগঠনিক বিধানটি জামায়াতকে এ পর্যন্ত বিভেদ ও বিভক্তি থেকে হেফাযত করেছে তা হলো, এর 'শূরা-ই নেযাম' বা পরামর্শভিত্তিক পদ্ধতি। জামায়াতে ইসলামীর সকল স্তরে এ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যে, সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তির একক মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয় না। গঠনতন্ত্রে মজলিসে শূরা বা রুকন বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয় বলে কোনো সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে গ্রুপ বা উপদল সৃষ্টি হয় না।

সমালোচনা ও সংশোধন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণের পর সংগঠন থেকে কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাই এ কথা মনে করা ছাড়া উপায় নেই যে, যারা এরপরও ভিন্ন পথ ধরেন, তারা নিজের কোনো ত্রুটির দরুনই সংগঠনের সাথে চলতে অক্ষম হন অথবা নিজস্ব মত ত্যাগ করার মতো উদারতার অভাবেই সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ব্যর্থ হন। এ জাতীয় মনোবৃত্তির লোকদের পক্ষে কোনো সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন চলা অসম্ভব।

www.bjilibrary.com

বিকল্প আন্দোলন সৃষ্টি

জামায়াতে ইসলামী কখনো এ দাবি করেনি যে, এ সংগঠন সবদিক দিয়েই নিখুঁত এবং দায়িত্বশীলগণ নিষ্পাপ ও নির্দোষ। একমাত্র নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত জামাআতই ত্রুটিহীন। নবী ছাড়া কোনো মানুষই নির্ভুল নয়। তাই জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ও সংগঠনে ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সাহাবায়ে কেরাম (রা) নবীর নেতৃত্বে যে জামাআতে শামিল ছিলেন, সে জামাআতই আমাদের আদর্শ। তাই ঐ উচ্চ মানের দিকে লক্ষ রাখলে কোনো উন্নতমানের জামাআতও নির্দোষ হওয়ার দাবি করতে পারে না।

যারা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ, তারা যদি জামায়াতে ইসলামীকে পছন্দ না করেন, তাহলে এর চেয়ে ভালো কোনো সংগঠন কায়েম করতে পারেন। এমনকি জামায়াতের পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার পরও ইসলামের বিচারে যদি কেউ আরো উন্নত মানের আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, তাহলে জামায়াত তাদেরকেও মুবারকবাদ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আজ পর্যন্ত যারাই জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে পরিচালিত কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তারা বিকল্প কোনো সংগঠন ও আন্দোলন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর আসল কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

তারা যদি একমাত্র ইসলামের স্বার্থেই ইসলামী আন্দোলন থেকে আলাদা হয়ে উন্নততর সংগঠন করার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হতেন, তাহলে এ মহান উদ্দেশ্য পূরণে হয়তো সফল হতে পারতেন। কিন্তু যে কারণে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো মানের সংগঠনই গড়ে তুলতে পারেনি তা হলো, জামায়াতের বিরুদ্ধে তাদের নেতিবাচক কার্যক্রম। তারা ইতিবাচক কর্মসূচি নিয়ে জামায়াত থেকে উন্নত কোনো সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে জামায়াতের অনেক লোকই ক্রমে সে সংগঠনে গিয়ে শামিল হতে পারত। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে একজন কর্মী জামায়াতে শরীক হন, সে উদ্দেশ্য যদি অন্য কোনো সংগঠনের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে লাভ করার সম্ভাবনা আছে বলে ঐ কর্মী মনে করেন, তাহলে তিনি কেন জামায়াতে ইসলামীতে আটক থাকবেন?

ইসলামের বিজয় ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৪১ সালে এ উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামী একটি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ দেশে ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র একটি সংগঠনের রূপ নিলেও ১৯৫৬ সালে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর প্রথম

www.bjilibrary.com

সফরের পূর্বে জনগণের নিকট এর প্রাথমিক পরিচয়ও ঠিকমতো প্রকাশিত হতে পারেনি। সে হিসেবে অনেক বিলম্বে জামায়াতে ইসলামী এ দেশে কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়েছে।

পাকিস্তান আমলেও জামায়াতে ইসলামী প্রত্যেক সরকারেরই চক্ষুশূল ছিল। আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬৪ সালে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই বেআইনী ঘোষিত হয়। তবুও জামায়াত স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামী যেভাবে পদে পদে সরকারি বাধার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে, তাতে বাংলাদেশ আমলে কাজের ময়দান সংকুচিত হওয়ারই কথা। কারণ, বাংলাদেশকে একটা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র বানানোর জন্য যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এ রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে দেশের শাসনতন্ত্রেই উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি ইসলামের নামে যাতে রাজনীতি করার সুযোগই না হয় সে ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রেই করা হয়েছিল। এরই ফলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কোনো ইসলামী দলই ময়দানে ছিল না।

আল্লাহর অসীম রহমতে বাংলাদেশের মাটিতে আবার ইসলামী আন্দোলন করার যে সুযোগ হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের জনগণের মধ্যে ইসলামী জীবনাদর্শ একটা দুর্জয় শক্তি হিসেবে বিরাজ করছে এবং জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি আন্দোলন এ পরিবেশেরই স্বাভাবিক দাবি।

১৯৭২ সালের পূর্বে ইসলামী সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, প্রতিষ্ঠান, অফিস, সংগঠন ইত্যাদি যা কিছু ১৫/২০ বছরে গড়ে উঠেছিল, তা '৭১ সালের ডিসেম্বরের রাজনৈতিক মহাপ্লাবনে ভেসে গেল। হাজার হাজার কর্মী শাহাদাত বরণ করেন। জেলের ভেতরে ও বাইরে যেসব নেতা ও কর্মী বেঁচে ছিলেন তারা ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের সম্পদ বলতে আর কিছুই বাকি ছিল না। বলতে গেলে '৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ঐসব নেতা-কর্মী আবার শূন্য হাতে আন্দোলনের কাজ শুরু করেন এবং ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনকে নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হন।

অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী আন্দোলনের ঢেউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে জনসাধারণের মধ্যে যে গতিতে চলছিল তাতে ইসলামবিরোধী শক্তি অস্থির হয়ে গেল। ১৯৮১ সালের মার্চ থেকে দীর্ঘ দুমাস প্রেসিডেন্ট জিয়া সরকারের চোখের সামনে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী মহল চরম উচ্ছৃঙ্খল পন্থায় যেভাবে

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনকে এ দেশের মাটি থেকে উৎখাত করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তাতে এ দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বশীল কোনো সরকার ছিল বলে মনে হয়নি।

এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের এটুকু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ময়দানের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে যারা জামায়াতে ইসলামীর সাফল্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে সক্ষম, তাদের সমালোচনাকে আমরা চলার পথের পাথেয় মনে করি। কিন্তু যারা এ কথা বলে যে, 'এত দিনেও জামায়াত ক্ষমতায় যেতে পারল না, ভবিষ্যতে আর কি আশা আছে?' তাদের মন্তব্য ইসলামী আন্দোলনের কোনো কর্মীকেই বিভ্রান্ত করতে পারে না।

ক্যাডার সিস্টেম

দুনিয়ায় যারাই কোনো নীতি ও আদর্শ কায়েম করতে চান তাদের সংগঠনে যেকোনো ধরনের লোককে তারা ভর্তি করেন না। তাই প্রত্যেক সংগঠনের সদস্য ভর্তির ব্যাপারে কতক শর্ত আরোপ করা হয়। যারা ঐসব শর্তে টিকে না তাদেরকে সদস্য বলে স্বীকার করা হয় না। এটুকু এমন সর্বজনীন নীতি, যার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য।

কোনো সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি মানুষের মধ্যে আপনা-আপনিই সৃষ্টি হতে পারে না; সংগঠনের পক্ষ থেকেই ঐসব গুণ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হয়। সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, ব্যাংক কর্মচারী, প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারীদের সিস্টেম থেকে এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এর কোনোটাই ক্যাডার সিস্টেম ছাড়া চলতে পারে না।

ক্যাডার সিস্টেম মানে হলো এমন এক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে যোগ্যতা ও গুণাবলির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করে যারা সংগঠনের যে পরিমাণ দায়িত্ব বহনের জন্য প্রস্তুত তাদেরকে ততটুকু দায়িত্ব দেওয়া। স্কুল-কলেজে যত ছেলে ভর্তি হয় তাদের সবাইকে কি একই ক্লাসে বসিয়ে একই মানের শিক্ষা দেওয়া হয়? যদি মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে তাদেরকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই সফল হবে না।

জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর যে দীনকে কায়েম করতে চায়, সে দীনের কতক স্পষ্ট দাবি আছে। যারা দীনকে কায়েম করতে চায় তাদের মধ্যে কী কী ঈমানী ও আমলী গুণ থাকা দরকার তা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। ঐসব গুণ যারা

www.bjilibrary.com

নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে আগ্রহী, তারাই জামায়াতের সংগঠনে ভর্তি হন। জামায়াতে ইসলামী কোনো সাধারণ রাজনৈতিক দল নয়। জামায়াত একটি আদর্শবাদী সংগঠন। রাজনৈতিক দলে কিছু ইস্যুর ভিত্তিতে সব ধরনের লোকই সহজে যোগদান করে। আবার তারা সহজেই দল পরিবর্তনও করে। তাই জামায়াত এভাবে লোক ভর্তি করে না।

জামায়াতের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও কর্মসূচির সাথে একমত হয়ে যারা জামায়াতে শামিল হন তাদেরকে 'সহযোগী সদস্য' হিসেবে প্রথমে ভর্তি করা হয়। এরপর জামায়াত তাদেরকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করে। যারা গঠনপদ্ধতি অনুযায়ী নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী, তারা নিয়মিত কর্মী হিসেবে গণ্য হন। কর্মী হওয়ার পর জামায়াত তাদেরকে কুরআন-হাদীসের আলোকে মন, মগজ ও চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তখন তারা দেখতে পায় যে, বর্তমান অনৈসলামী সমাজে বাস করে বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব। এ সত্ত্বেও কর্মীদের মধ্যে যারা নিষ্ঠার সাথে এ কঠিন পথকে কবুল করতে চান, তাদেরকে জামায়াতের সদস্য বা 'রুকন' হিসেবে গণ্য করা হয়।

যারা জামায়াতের সাথে সম্পর্ক রাখেন তারা সহযোগী সদস্য, কর্মী, রুকন হিসেবে পরিচিত হন। এ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত না করে যদি সবাইকে জামায়াতের রুকন বলে গণ্য করা হয় তাহলে ইসলামী আদর্শে লোক তৈরি করার উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। কলেজে ভর্তি হলেই সবাই ডিগ্রি পাওয়ার যোগ্য হয় না এবং আইএ, বিএ ও এমএ ক্লাসে ছাত্রদেরকে বিভক্ত না করলে ক্রমে উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়া যায় না। তেমনি জামায়াতে ইসলামীকে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যায়। ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে কায়েম করতে হলে এমন একদল লোক তৈরি করতেই হবে, যারা নিজেদের জীবনে ইসলামকে নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে চেষ্টা করে। এ জাতীয় লোকদের মধ্য থেকেই ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে।

আদর্শবাদী লোক তৈরির কারখানা হিসেবে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী বিপ্লবের যোগ্য মন-মগজ ও চরিত্রবিশিষ্ট এক বাহিনী গঠন করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে। তাই এসব সংগঠনও মানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করে লোক

www.bjilibrary.com

তৈরি করছে। এ পদ্ধতিই 'ক্যাডার সিস্টেম' নামে পরিচিত। আদর্শহীন লোকদের কাছে এ পদ্ধতি পছন্দনীয় না হওয়াই স্বাভাবিক। যারা বিভিন্ন কৌশলে নেতা হওয়ার ধান্দায় আছে, তারা এ পদ্ধতির নিন্দা করতেই পারে।

ইসলামী আন্দোলনের একশ্রেণীর নিন্দুক জামায়াতের এ পদ্ধতিটিরও সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এ পদ্ধতির জন্য গৌরববোধ করে। নিন্দুকেরা নাকি বলে বেড়ায় যে, রাসূল (স) এ পদ্ধতিতে কাজ করেননি। তারা হিসাবে বিরাট ভুল করে বসেছেন। রাসূল (স)-এর আন্দোলনের মাক্কী যুগে মুসলিম হওয়াই এমন বিপজ্জনক ছিল যে, বাতিলের জুলুম-অত্যাচারের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ক্যাডার সিস্টেম চালু হয়েছিল। যারা আদর্শের দিক দিয়ে দুর্বল তারা বাতিলের সৃষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়ে আপনা-আপনিই ছাঁটাই হয়ে যেত। কে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তা তাদের আচরণ থেকেই জানা যেত। এটাই হলো আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক ক্যাডার সিস্টেম।

ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে সময় সময় জামায়াতের যে টক্কর হয়েছে তাতেও দেখা গেছে যে, কোনো লোক পেছনের কাতার থেকে সামনে এগিয়ে গিয়েছে এবং কেউ কেউ নিজের স্থান থেকে পিছিয়ে পড়েছে। এটাই 'ন্যাচারাল ক্যাডার সিস্টেম'। জামায়াত যে সহযোগী সদস্য, কর্মী ও রুকনের ক্যাডার সিস্টেম চালু করেছে তা ঐ আসল ক্যাডারে পৌঁছার প্রস্তুতি মাত্র। রাসূল (স)-এর সময় ইসলামী আন্দোলনের বাইরে কোনো মুসলমানই ছিল না। তখন মুসলমান হওয়ার অর্থ ছিল ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়া এবং বাতিলের সাথে সংঘর্ষের জন্য তৈরি হওয়া। আর বর্তমানে বাতিলের খিদমতে নিযুক্ত থেকেও ইসলামের বড় খাদেম হিসেবে গণ্য হওয়া সম্ভব। ইসলামকে অবহেলা করেও মুসলমানদের নেতা হওয়া, এমনকি ইসলামের বিরোধী হয়েও মুসলিম দাবি করা এ সমাজে সহজ। এ অবস্থায় এ জাতীয় মুসলিমদেরকে নিয়ে গঠিত কোনো সংগঠন দিয়ে কি ইসলাম কায়েমের চিন্তা করা যায়? তাই বর্তমান মুসলিম সমাজ থেকে যারা খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে চান, তাদেরকে গড়ে তোলার প্রয়োজনেই এ ক্যাডার পদ্ধতির দরকার।

নিন্দুকেরা নাকি বলে যে, জামায়াতে ইসলামীর ক্যাডারের বাইরে যারা আছে তাদেরকে জামায়াত মুসলমানই মনে করে না। মনের খবর তো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না; তারা এ খবর কেমন করে জোগাড় করল? জামায়াতের সব লোকই নামাযের জামাআতের সময় হলে যেকোনো মসজিদেই ইমামের সাথে

www.bjilibrary.com

নামায আদায় করে। এমনকি যদি কোনো ইমাম জামায়াতের বিরোধীও হয় তবুও তার পেছনে তারা নামায আদায় করতে দ্বিধা করে না।

দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কোনো আদর্শবাদী আন্দোলন ক্যাডার পদ্ধতি ছাড়া আদর্শের ভিত্তিতে লোক তৈরি করতে পারেনি। যারা সত্যিকারভাবে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে কায়েম করতে চান তাদেরকে এ পদ্ধতিতেই লোক তৈরি করতে হবে।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু না থাকায় ইসলামী আকীদা ও বুনিয়াদী ইসলামী শিক্ষা দান করা এবং ইসলামী চরিত্র গঠনের সর্বজনীন ব্যবস্থা নেই। যারা জন্মগতভাবে মুসলিম, তাদের পক্ষে সচেতনভাবে মুসলিমরূপে গড়ে ওঠার সুযোগ না থাকায় সমাজের অধিকাংশ মুসলমানই প্রকৃত মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থায় নামেমাত্র মুসলমান বলে পরিচিত লোকদের দ্বারা ইসলামী সমাজব্যবস্থা কী করে কায়েম হতে পারে? তাই এ সমাজ থেকে ক্যাডার পদ্ধতিতে ইসলামী মন, মগজ ও চরিত্রের ভিত্তিতে লোকদেরকে সংগঠিত করা এবং যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব এ জাতীয় লোক তৈরি করা ছাড়া ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

আবারও এ কথা বলা দরকার মনে করছি যে, মুসলিম সমাজের বর্তমান দুরবস্থার কারণে জামায়াতে ইসলামী যে ক্যাডার সিস্টেমে কাজ করছে তা আসল ক্যাডার নয়। বাতিল শক্তির সাথে টক্করের ফলে এর মধ্য থেকেও ছাঁটাই হতে থাকে। হক ও বাতিলের সংঘর্ষের শেষ পর্যায়ে যারা টিকে থাকবে তারাই আসল ক্যাডার। ঐ আসল ক্যাডার হিসেবে টিকে থাকার যোগ্য বানানোর জন্যই বর্তমান আকারে ক্যাডার দরকার। এ সিস্টেমকে তারাই কঠিন মনে করে, যারা নিজেদেরকে বাতিলের বিরুদ্ধে মযবুত বানাতে প্রস্তুত নয়।

হোল টাইম ওয়ার্কার

'হোল টাইম ওয়ার্কার' কথাটি ইংরেজি ভাষায় হলেও পরিভাষা হিসেবে আন্দোলনের ময়দানে এ কথাটি খুবই পরিচিত। যারা তাদের গোটা সময় আন্দোলনের কাজেই লাগায়, তারাই 'হোল টাইম ওয়ার্কার'। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সমান তাওফীক দেন না। যারা তাদের দেহ ও মন এবং শ্রম ও চিন্তা ইসলামী আন্দোলনেই ব্যয় করেন তারা এটাকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছেন বলে বোঝা যায়। তারা তাদের গোটা সত্তাকে নিষ্ঠার সাথে এ পথেই নিয়োগ করে থাকেন। সব আন্দোলনেই কিছুসংখ্যক লোক এমন দেখা যায়, যারা সব কিছু কুরবান করে হলেও সংগ্রামের কঠিন পথে মযবুত হয়ে টিকে থাকেন।

www.bjilibrary.com

এ জাতীয় লোকদের সংখ্যা কমই দেখা যায়। তাদের নিষ্ঠার ফলেই আন্দোলনের সাথীরা তাদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং নেতার মর্যাদা দেয়। তাদের মধ্যে এমন লোক খুবই দুষ্প্রাপ্য, যাদের কোনো রোজগার করার দরকার হয় না। তাই তাদেরকে জীবন রক্ষা ও পরিবার প্রতিপালনের প্রয়োজনে রুজি-রোজগারের জন্য কিছু সময় ও শ্রম ব্যয় করতে বাধ্য হতে হয়। এ জাতীয় লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার যে নেক জযবা রাখেন সে জযবাই এ আন্দোলনের প্রাণ। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্য যে এরা আন্দোলনে আসেননি, তা তাদের কার্যাবলি ও আচরণ থেকেই বোঝা যায়।

জামায়াতে ইসলামীর এমন ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি রয়েছে যে, বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে এমন কতক দায়িত্বশীল দরকার, যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঐসব দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার দরুন তাদের পক্ষে নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কোনো রকম রুজি-রোজগার করার সময় ও সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, কিছুসংখ্যক দায়িত্বশীল 'হোল টাইম' এ কাজে না লাগালে জামায়াতে ইসলামীর মতো একটা সংগঠন সঠিক মানে চালু থাকতে পারে না। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ১৯৪১ সালে এ সংগঠন শুরু করার কিছু দিনের মধ্যেই 'হোল টাইম' পদ্ধতি চালু করতে বাধ্য হয়েছেন।

জামায়াতের যেকোনো পর্যায়েই যখন কোনো 'হোল টাইম ওয়ার্কার' নিয়োগ করা দরকার মনে হয় তখন উপরিউল্লিখিত নিষ্ঠাবান কর্মীদের মধ্য থেকেই বাছাই করা হয়। যেসব দায়িত্ব হোল টাইম ছাড়া পালন করা সম্ভব নয় সেসবের যোগ্য লোকই এজন্য তালাশ করা হয়। কেউ নিজে আগ্রহ করে এ দায়িত্বের বোঝা নেওয়ার চেষ্টা করে না। কারণ, এটা কোনো লাভজনক পেশা নয়। দায়িত্ব কোনো ফুলশয্যাও নয়। এসব দায়িত্ব নেওয়া মানে বিপদ-মুসিবত, জেল-যুলুম, ঝামেলা, বাধা-বিপত্তি ইত্যাদিকে নিজের উপর ডেকে আনা। এ দায়িত্বের বোঝা বহন করতে তারাই রাজি হন, যারা আন্দোলনের স্বার্থে নিজেদের পেশা ও ক্যারিয়ার কুরবানী করতে প্রস্তুত।

এ জাতীয় দায়িত্বের যোগ্য যাদেরকে মনে করা হয় তাদেরকে জামায়াত নিজের সকল কাজ-কর্ম, চাকরি ও পেশা ছেড়ে দিয়ে সবটুকু সময় ও শ্রম জামায়াতের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করার জন্য নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ যিনি পালন করতে

www.bjilibrary.com

রাজি হন, তিনি প্রকৃতপক্ষে ত্যাগী মনোভাবেরই পরিচয় দেন। এটা ত্যাগের পথ। এটাকে আজ পর্যন্ত কেউ নিরাপদ চাকরি মনে করেনি।

এভাবে যারা জামায়াতের হোল টাইম ওয়ার্কার হতে রাজি হন তাদেরকে জামায়াত স্বাভাবিক কারণেই অতি শ্রদ্ধার পাত্র মনে করে। তাদের সাথে জামায়াত কখনো কর্মচারী হিসেবে ব্যবহার করে না। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতার মর্যাদাই দেওয়া হয়।

যেসব লোকের উপর আন্দোলনের প্রয়োজনে যোগ্য ও ত্যাগী মনে করে এভাবে কোনো দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়, তাদের নিম্নতম পারিবারিক প্রয়োজনটুকু পূরণ করার ব্যবস্থা করা জামায়াতের উপরই ফরয। তাই তাদের নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইতুল মাল থেকে ব্যবস্থা করা হয়। যাদের নিজস্ব আয়ের কোনো পথ আছে, তারা বাইতুল মাল থেকে কিছুই নেন না। যারা নিতে বাধ্য হন তারাও প্রয়োজনমতো নেন; প্রয়োজন কমলে সেটুকুও নেওয়া বন্ধ করে দেন।

এ আন্দোলনের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী এসব কথা জানার পর হোল টাইম সিস্টেমকে মন্দ মনে করতে পারে না। এ সিস্টেম তুলে দিলে এ সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই ঢিলা ও দুর্বল হয়ে পড়বে। এ সংগঠনের দায়িত্বের ধরন ও কাজের পরিধি সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা এসব কথা নিয়ে সমালোচনা করতে পারেন। অবশ্য যারা নিন্দুক এবং জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর পেশা গ্রহণ করেছে, তাদের নিন্দাবাদের কোনো প্রতিকার নেই।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

১. সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত) –অধ্যাপক গোলাম আযম [পৃষ্ঠা ১৪৩৪; মূল্য ৬৬০]
২. কুরআনের পরিভাষা –ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ১২০]
৩. কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ –অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম [পৃষ্ঠা ১৬৮; মূল্য ৮০]
৪. মহানবী (স)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য –ড. কাজী দীন মুহম্মদ [পৃষ্ঠা ১২০; মূল্য ৭০]
৫. মহানবী (স)-এর উপদেশ –ড. কাজী দীন মুহম্মদ [পৃষ্ঠা ৮০; মূল্য ৪৫]
৬. নাস্তিকতা ও আস্তিকতা –ড. কাজী দীন মুহম্মদ [পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ৪০]
৭. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াত –প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী [পৃষ্ঠা ১৯২; মূল্য ১২০]
৮. মহানবী (স)-এর দাওয়াত: পর্যায়ক্রমিক কৌশল ও মাধ্যম –প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী [পৃষ্ঠা ৩৯২; মূল্য ২২০]
৯. সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন প্রথম খণ্ড –মূল: ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনু: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম [পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ১৫০]
১০. সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন দ্বিতীয় খণ্ড –মূল: ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা, অনু: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম [পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ১৫০]
১১. সহজ তাওহীদ –মূল: আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আল হুয়াইল [পৃষ্ঠা ১২০; মূল্য ৬০]।
১২. আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি –আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
১৩. পরকাল ও তার প্রমাণ –মূল: সৈয়দ হামিদ আলী (ভারত), অনু: মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস [পৃষ্ঠা ৪৮; মূল্য ৩০]
১৪. আদর্শ মুসলিম (প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ রূপরেখা) –মূল: ড. মুহাম্মদ 'আলী আল হাশিমী, অনু: মাসউদুর রহমান নূর [পৃষ্ঠা ৩৯২; মূল্য ১৮০]
১৫. আদর্শ মুসলিম নারী (প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ রূপরেখা) –মূল: ড. মুহাম্মদ 'আলী আল হাশিমী, অনু: মাসউদুর রহমান নূর [পৃষ্ঠা ৫৬০; মূল্য ২৮০]
১৬. মাসাইল সংকলন (কিতাবুত তাহারাত) –মুহাম্মদ হিফযুর রহমান [পৃষ্ঠা ৩৪৪; মূল্য ১৬০]
১৭. আমার নামায আমার জীবন –এসএম আবদুচ ছালাম আজাদ [পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ৫০]
১৮. মাসাইলে সাহু সিজদাহ –মূল: মুফতী হাবিবুর রহমান খয়রাবাদী (ভারত) অনু: মুফতী মুহাম্মাদ ওমর ফারুক [পৃষ্ঠা ৬৪; মূল্য ২৫]
১৯. ইসলামে হজ্জ ও ওমরা –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ৫৪৪; মূল্য ২৮০]
২০. ইবাদাতের নামে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আত– হাফেয মাহমুদুল হাসান [পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য ৪৫]

www.bjilibrary.com

২১. জীবনে যা দেখলাম (৯ম খণ্ডে সমাপ্ত) –অধ্যাপক গোলাম আযম [পৃষ্ঠা ২৭২৮; মূল্য ১২০০]

২২. বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস (১৯৭৮-২০০৫) –অধ্যাপক গোলাম আযম [পৃষ্ঠা ১৪৪; মূল্য ৬০]

২৩. আমার কাল আমার চিন্তা –শাহ্ আবদুল হান্নান [পৃষ্ঠা ২৩২; মূল্য ১২০]

২৪. দেশ সমাজ রাজনীতি –শাহ্ আবদুল হান্নান [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ১২০]

২৫. বুদ্ধির ফসল: আত্মার আশিস –অধ্যাপক শাহেদ আলী [পৃষ্ঠা ২৪৮; মূল্য ১৪০]

২৬. প্র্যাকটিস অব হারবাল মেডিসিন –আ স ম শামুন অর রশীদ [পৃষ্ঠা ২৪০; মূল্য ১৬০]

২৭. আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ [পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ১৪০]

২৮. মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ [পৃষ্ঠা ১৪২; মূল্য ৭০]

২৯. নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা –ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ [পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ৬০]

৩০. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা –মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ১৬০]

৩১. ইসলামী ব্যাংকিং –মূল: ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী (মিসর) [পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ৫০]

৩২. ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন, পদ্ধতি, প্রয়োগ পদ্ধতি –মুহাম্মদ মাহ্ফুজুর রহমান ও বি এম হাবিবুর রহমান [পৃষ্ঠা ২০৮; মূল্য ১২০]

৩৩. মানুষের শেষ ঠিকানা –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ৩৬৮; মূল্য ১৬০]

৩৪. মুসলিম যুবসমাজের ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ৩৩৮; মূল্য ২২০]

৩৫. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ফযীলত ও কৃতপণতার পরিণাম –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ১০৪; মূল্য ৪০]

৩৬. যুগে যুগে ঈমানের পরীক্ষা, যালিমের পরিণতি ও আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ১২০]

৩৭. ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা, কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভিশন –আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ [পৃষ্ঠা ১৬৮; মূল্য ৭০]

৩৮. আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম –মূল: ড. অহীদুদ্দীন খান (ভারত) [পৃষ্ঠা ২০৮; মূল্য ১৬০]

৩৯. মহিলা মাসাইল –মূল: সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি অনুবাদ: মাসউদু রহমান নূর [পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ১০০]

৪০. ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ –ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান [পৃষ্ঠা ১৪৪; মূল্য ৮০]

৪১. ইবনে বতুতার সফরনামা –অনু: মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ১২০]

৪২. কথোপকথন : আল মাহমুদ –ওমর বিশ্বাস সম্পাদিত [পৃষ্ঠা ১৭৬; মূল্য ১০০]

৪৩. বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি –ড. শেখ মোঃ ইউসুফ [পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য]

বি. দ্র. পরবর্তী মুদ্রণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য পরিবর্তন হতে পারে।

www.bjilibrary.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.bjilibrary.com